IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

অষ্টম গর্ভ : বাস্তব প্লটে পুরাণের হাতছানি

(Astom Gorvo: Bastob Plote Puraner Hatchani)

গীতশ্রী ইন্দ্র

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, গান্ধী সেন্টিনারি বি. টি. কলেজ, হাবড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩২৬৮

গবেষক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

সার – সংক্ষেপ :

ভারতবর্ষের সাহিত্য - সংস্কৃতির ধারা প্রবাহের প্রধান উৎস পুরাণ। বহু শতাব্দী ধরে চলমান মানব জীবনের মানসলোকের সুগভীর কিছু ধ্রুব ও বাস্তব প্রতীতিই পুরাণের কাহিনিতে স্থান পায়। পুরা + 'তন' (ষ্টন) যোগে (নিপাতনে 'ত' লোভ পেয়েছে এবং 'ণত্ব' নির্দেশ) সৃষ্ট 'পুরাণ' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ পুরাতন ।সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানব, অতিমানব, অসুর, রাক্ষস, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, ভূত - ভবিষ্যৎ - বর্তমানের ইঙ্গিত; এসব নিয়েই পুরাণ। পুরাণের পরিধি ও পরিসর - ব্যাপক ও বিস্তৃত। পুরাণের বিভিন্ন তত্ত্বকথা বর্তমান সমাজের মূল্যবোধের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। আবেগ তাড়িত মানুষ হিসাবে, আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজ পৌরাণিক কাহিনির ওপর নির্ভর করে বিশ্লেষণ করতে ভালোবাসি; কখনো কখনো চরিত্রের সাথেও একই অনুকরণের প্রয়াস সোচ্চার হয়ে ওঠে। জ্ঞানত আবার কখনও অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়েই, পৌরাণিক কাহিনি থেকে গৃহীত বিশেষ শব্দগুচ্ছ আমাদের কথোপকথনে ব্যবহৃত নিয়মিত শব্দ হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে। 'অষ্টম গর্ভ' শব্দটি কেবল অষ্টম গর্ভ নয়, এটি বাণী বসুর লেখা 'অষ্টম গর্ভ' নামে এই উপন্যাসে একটি বিশাল অর্থ বহন করে। বিশ্লেষণের আধারে, পৌরাণিক যুগ অতিক্রান্তের দীর্ঘ সময় পেরিয়েও বাস্তব জীবনে তার প্রভাব মনুর সন্তানদের সমাজে আবদ্ধ করে রাখতে সহায়ক।

বিশেষ শব্দ : মিথ, মাইথলজি, পুরাণ, বিশ্বাস, অষ্টম গর্ভ, বাস্তবতা, প্রকৃত জীবন

বাংলা সাহিত্যে পুরাণের কাহিনি ও চরিত্রকে নিয়ে নাটক, কাব্যনাট্য গড়ে উঠেছে বহুকাল আগে থেকেই। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য 'ঊনিশ শতকের বাংলা কাব্যের নবজন্ম' পৌরাণিক বিষয়কে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল। বাস্তব জীবনে পুরাণকে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়, এমন একটি ধারণার বেড়াজালে আবদ্ধ ছিলেন তৎকালীন কথাসাহিত্যিকেরা। প্রাবন্ধিক ক্ষেত্রগুপ্তের (১৯৩০ - ২০১০) মতে, উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগে 'পৌরাণিক' বলে যে একটি স্বতন্ত্র পর্যায় থাকতে পারে সে কথা এর আগে ভাবা হয়নি। উপন্যাসে বাস্তবতা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। পুরাণের সেই বাস্তবতা প্রতিষ্ঠা প্রায় অসম্ভব বলেই মনে করতেন ঔপন্যাসিকরা। পুরাণ ছিল কল্পনার রঙে রঙিন অথচ উপন্যাস চায় বাস্তব পটভূমি। এই সময়, কথাসাহিত্যে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ পুরাণকে সাহিত্যে স্থান দিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী; পুরাণ নিয়ে তিনি নিজের বিভিন্ন গ্রন্থে নানা পরীক্ষা - নিরীক্ষা করেছেন । কিন্তু এই ধারার কথকদের রচনা, ভাষার জটিলতার কারণে সাময়িক প্রসিদ্ধি লাভ করলেও বেশিদিন তা স্থায়ী হয়নি। এরপর ড: দীপক চন্দ্র (১৯৩৮ - ২০১৩) পৌরাণিক নানা চরিত্র যা প্রকৃতপক্ষে ছিল প্রচ্ছন্ন, তাদের যেমন কাহিনির কেন্দ্রে আনেন তেমনি বিখ্যাত চরিত্রগুলিরও নবনির্মাণে ব্রতী হন। বাস্তবের কাহিনিতে পুরাণের চরিত্রগুলিকে নানা ব্যাখ্যা ও যুক্তিতে নতুনভাবে সাজিয়ে পাঠকদের উপভোগ করার সুযোগ করে দিলেন। তাঁর লেখা কৃষ্ণবিষয়ক উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম 'শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম'। এটি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে রচিত প্রথম পৌরাণিক ট্রিলজি । 'শ্রীকৃষ্ণ এলেন দ্বরকা'য় ১ম ও ২য় খণ্ড, 'ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণ' (১৯৬১) ও 'বিষন্ন শ্রীকৃষ্ণ' (১৯৮১) ও এই তিনটি উপন্যাসের অখন্ড সংস্করণ। 'বিষন্ন শ্রীকৃষ্ণ' উপন্যাসটি কৃষ্ণের যুদ্ধ পরবর্তী ব্যাকুলতা ও ব্যর্থতার পটভূমিতে লেখা। কৃষ্ণ এখানে নিজেকে 'কালের পুতুল' বলে মনে করেছেন। এই ট্রিলজি থেকে মহাভারত, রামায়ণ ও বিভিন্ন পুরাণের নানা অলৌকিক ঘটনার আধিক্যকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। যার ফলস্বরূপ পাঠকবর্গের অসংখ্য কৌতূহলের নিবারণ ও নানা প্রশ্নের উত্তর দিতেই 'কৃষ্ণস্তু ভগবান' উপন্যাসটি প্রকাশ করেন কথক। 'শ্রীকৃষ্ণ সুন্দরম'(১৯৯৪) তাঁর রচিত অপর একটি অখন্ড সংস্করণ। এর মধ্যে অন্য ধাঁচের কৃষ্ণ বিষয়ক চারটি উপন্যাস সংযোজিত হয়েছে - 'যদি রাধা না হতো', 'কৃষ্ণস্তু ভগবান', 'কৃষ্ণ অর্জুন সংবাদ' ও 'মন বৃন্দাবন'। 'কৃষ্ণ অর্জুন সংবাদ' কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছুক অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের দৃপ্তভাষণের পটভূমিতে গল্পের আধারে বিবৃত হয়েছে। ভগবানকে চোখে দেখা যায় না তবুও মানুষের মনে বিশ্বাসে তিনি জাগ্রত। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবজগতের পরম আশ্রয় ভগবান। যেকোনো ধর্মপরায়ণ মানুষের কাছে ভগবান দয়াময়, করুণাময়, মঙ্গলময় রূপে অবস্থান করেন। ভালোবাসার অপর নাম ভগবান, এই কথা সারমর্ম বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন -

"দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা"।

মহাভারতে 'কৃষ্ণ' মানব রূপে অবতীর্ণ সাধারণ রাজনৈতিক নেতা, পরহিতৈষী, চরিত্র মাধুর্যে পূর্ণ , সকলের কাছে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবান এক পুরুষ। কৃষ্ণ মহাভারত কর্মমাগ থেকে ভক্তিমার্গের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। উপন্যাস 'কৃষ্ণস্তু ভগবান' - এ পৃথিবীর আর সব মানব শিশুর মতোই জন্মগ্রহণের পর, চরিত্রগুণ ও ব্যক্তিত্বের জোরে অলৌকিক শক্তি ধারণকারী ভগবান এ পরিণত হওয়ার সংঘাতপূর্ণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ এখানে বাস্তব প্লটের মানুষ। পুরাণের কৃষ্ণও একদিনে ভগবানে রূপান্তরিত হয়নি তা মহাভারতেই উল্লিখিত। কথাসাহিত্যিক দীপক চন্দ্রের কৃষ্ণ মানব রূপে ধীরে ধীরে বাস্তবের মাটিতে নেমে এসেছেন।

পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গিরও ক্রমশ পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানের কৃষ্ণ শুধু ভগবান না, তিনি বাঙালির ঘরের ছেলে।

পুরাণের বিভিন্ন তত্ত্বকথা বর্তমান সমাজের মূল্যবোধের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয় । পুরাণের চরিত্ররা বাস্তব জগতে প্রকৃতরূপে না থাকলেও রূপকের ছলে সর্বদাই ভ্রাম্যমাণ । বর্তমান মানবসমাজের নিত্যনৈমিত্তিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনার উল্লেখ, ইতিবাচক বা নেতিবাচক ভঙ্গিতে প্রকাশ পায় । বাঙালির চিরপরিচিত পৌরাণিক চরিত্র, ঘটনাগুলি যেমন - রূপবান পুরুষ অর্থে 'ময়ূর ছাড়া কার্তিক', দুর্বল অসহায় প্রাণীর ক্ষেত্রে 'কৃষ্ণের জীব', ভয়ঙ্কর ঝগড়ায় 'কুরুক্ষেত্র - কাণ্ড', প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থের নির্দেশ করতে 'কুবেরের ভাণ্ডার', তুমুল হট্টগোলে 'কিস্কিন্ধ্যাকান্ড', নারীহৃদয় অর্জন করা ব্যক্তিকে 'কলির কেষ্ট' ইত্যাদি নানা বাগধারার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশের চট্টগ্রামে গানের ক্ষেত্রে প্রচলিত 'কানু বিনে গীত নাই' । এখানে কৃষ্ণের একাধিক নামের কোনো না কোনো নাম বা পরিচয় ছাড়া একটিও গান যে তৈরি হতে পারে না তা বোঝানো হয়েছে । মানবসমাজে অর্থাৎ বাস্তব জগতেও এর দ্বিরুক্তি ঘটে না । পুরাণের (পুরাতন) নানা অংশ জীবন অভিজ্ঞতার পথ ধরে ফুটে ওঠে কথকের কলমে । মানব জীবনের সঙ্কট মুহূর্তের মাঝে সচেতনতার আনয়ন করা একজন ঔপন্যাসিকের প্রধান কাজ । অবশ্যই এতে মিশে থাকে নিজের জীবনবোধের কাহিনি, সমাজকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, সর্বোপরি কলমের জোর - যা দিয়ে সমাজকেও নবরূপে তুলে ধরা যায় । ঔপন্যাসিক বাণী বসু (১৯৩৯ -) পুরাণের চরিত্রদের মানব জগতের বাস্তবতার নিরিখে, তিনটি শিশুর অবলোকনে সমাজসচেতন মননের আশ্রয় নিয়ে গড়ে তোলেন 'অষ্টম গর্ভ'(২০০০) উপন্যাসটি ।

ঊনিশ শতকের ত্রিশের দশকের অন্তভাগে হাওড়া বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজের ইংরাজি বিষয়ের অধ্যাপিকা তথা ঔপন্যাসিক বাণী বসুর জন্ম ২৬ শে ফাগুন ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে (১১ই মার্চ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ) উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুরে । বাবা সূর্যপ্রকাশ রায়চৌধুরী একজন পন্ডিত মানুষ ছিলেন । ছোটবেলায় ঔপন্যাসিকের ছোটদি, গৌরী ধর্মপাল - এর প্রভাবেই তাঁর জীবনে বহির্বিশ্বের জ্ঞানের দরজা খুলে গিয়েছিল । জন্মের পর থেকে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনার সাক্ষী তাঁর জীবন । ভারতের বিভিন্ন পরিচিত ঘটনাকে বাধা নিয়মের বেড়া ভেঙ্গে বারবার পাঠককে উপহার দিয়েছেন লেখিকা । সাহিত্যজগতে স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক ইংরেজি সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন । তাঁর প্রথম শিক্ষাস্থল হল লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ এবং তারপর স্কটিশ চার্চ কলেজ । তিনি ছাত্রজীবন থেকেই সাহিত্যচর্চায় পারদর্শিতার প্রমাণ রেখেছেন । তাঁর প্রথম গল্প 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় । প্রথম উপন্যাস 'জন্মভূমি মাতৃভূমি' ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে শারদীয়া 'আনন্দলোক' - এর মাধ্যমে পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে যায় । চিরাচরিত নিয়মের ছাঁচে - বাধা লেখার ভঙ্গিমা থেকে মুক্ত হয়ে লেখিকা নায়ক-নায়িকার মিলন, যৌনাচার, নারীবাদী ভাবনা থেকে সরে এসে সমাজের প্রকৃত অবস্থানকে রচনার অঙ্গ করে তোলেন । পাঠকবর্গের চাহিদা সম্পর্কে ক্ষেত্রগুপ্ত একসময় বলেছিলেন, বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে ঐপৌরাণিক পরিমণ্ডল অত্যন্ত প্রিয় । পাঠকশ্রেনির এই চাহিদার কথা মাথায় রেখে, স্বাধীন - মুক্ত সৃষ্টি ও মৌলিক চিন্তাধারা ঔপন্যাসিক বাণী বসুকে প্রতিভার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে ।

'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর সাগর সেনের উৎসাহে ও আবেদনে সাড়া দিয়ে নিজের জীবনকাহিনি নিয়ে লিখতে অগ্রসর হন লেখিকা । ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ - ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ) ও ইংরেজ শাসনাধীনের শেষ পর্বের (১৭৫০ - ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) ভয়াবহ পরিস্থিতিতে জন্মগ্রহণ করার ফলে, চারিপাশের ঘটনা শৈশবকাল থেকেই তাকে প্রভাবিত করেছিল । গান্ধীজীর 'শ্রমিক আন্দোলন' (১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ) - এর সূচনা ও ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ হয় । লেখিকা জন্ম থেকে উত্তর কলকাতায় বাস করায় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের আগের বছর এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছর পরের উদ্বাস্তু সমস্যা – বাস্তুহারা, ছিন্নমূল, নিঃস্ব, স্বজনহারা মানুষের আর্তনাদ, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ রূপ নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছিলেন । এরপর ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে 'খাদ্য আন্দোলন' দমনের জন্য মিছিলে গুলি চালায় পুলিশ । সেই অভিজ্ঞতা ও জীবনের কথা তাঁর লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে বারংবার । পরিবর্তন মানবজীবনের ধর্ম । দেশকাল সময়ের চাহিদা সেই ধর্মের মুখকে ত্বরান্বিত করে । সময়ের কথা, আন্দোলনের দোলা, ভবিষ্যতের সমাজ গড়ার চাবিকাঠি হয়ে ওঠে সাহিত্য । পুরাণ সময়ের কথা বলে, বলে মানবিক গতি প্রকৃতির কথা, চলার পথের নির্দেশ নিহিত থাকে তারই গর্ভে । তাই পৌরাণিক চরিত্র - ঘটনাকে ভুলে নয়, মেটাফোর - এর মতন ব্যবহার করে ধর্মসংস্কার, কুসংস্কার, বিশ্বাস - অবিশ্বাসও বাস্তব জীবন - সাহিত্যের অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে, তা বাণী বসু প্রমাণ করেছেন । তাঁর রচনা পুরাণ; পুরাতনের কথা বলে; স্বনামধন্য উপন্যাস 'মৈত্রেয় জাতক'(১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ) যেমন কোনো পুরাণ জাতকের গল্প নয়, সমাজের কথা, মানুষের কথা; তেমনি মহাভারতের নানা ঘটনা ও চরিত্রকে নিয়ে প্রায় ৭ টি উপন্যাস রচনা করেছেন ঔপন্যাসিক । ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় পুরাণ – পুরাতন, মহাকাব্য, হিন্দু শাস্ত্রের উল্লিখিত নানা বিষয় লোককথাকে রূপকের ছ'লে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত নিয়ে রচিত এক ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস 'অষ্টম গর্ভ' । আন্তর্জালিক মাসিক পত্রিকা 'হৃদপিণ্ড' - এর সাক্ষাৎকারে বাণী বসু এই উপন্যাস সম্পর্কে বলেছিলেন -

"আমার জীবন, আমার সময় নিয়েই লিখি । তার ফল অষ্টম গর্ভ" ।

'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাসের নামটি প্রথমেই আকর্ষণ করে পুরাণ, লোককথা, লোকবিশ্বাস ও ধর্মকেন্দ্রিক কথকথাকে । পুরাণ ও বাংলা ধর্মসাহিত্যে বিষ্ণুর অষ্টম অবতার কৃষ্ণ । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, হরিবংশ, ভগবদগীতা, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি বহু পুরাণে কৃষ্ণ জীবনের নানা দিকের বিবরণ পাওয়া যায় । পুরাণ মতে মথুরার যাদব বংশীয় রাজ - পরিবারের সন্তান কৃষ্ণ । নিয়তির বিধানে, বসুদেবের সাথে কংসের বোনের বিয়ে হয় । পৃথিবীতে রাজা রূপে অসুরদের জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে অভিযোগ জানালে, ব্রহ্মা ও শিবের অনুরোধে বৈকুণ্ঠ বিলাসী, দেবকীর গর্ভে অবতরণের কথা জানান । অন্যদিকে কংসের জীবনলীলার সমাপ্তি দেবকীর সন্তানের হাতে তা জানতে পেরে প্রথমেই বোনকে স্বামীসহ কারারুদ্ধ করেন কংস । এরপর একের পর এক সদ্যোজাত শিশুদের হত্যা করেন নিজহাতে । দেবকীর অষ্টম বারের গর্ভের সন্তান ও বিষ্ণুর অষ্টম অবতার কৃষ্ণ । কংস হন্তারক কৃষ্ণ । বহু অসুরের প্রকোপ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতেই কৃষ্ণের মানব রূপে আগমন । হিন্দু ধর্মের আধার তথা মহাভারতে কৃষ্ণ একজন ক্ষত্রিয় । গীতায় কৃষ্ণ ধর্মের সারমর্ম বোঝানোর মাধ্যমে মানব জগতকে উদ্ধার করেছেন, দেখিয়েছেন জীবন নির্বাহের সহজ পন্থা । পতঞ্জলির মতে, মহাভারতে কৃষ্ণের কূটনীতিবিদ পরমতত্ত্ব, ধর্মের আধার । বৈষ্ণব শাস্ত্র মতে, কৃষ্ণকে সখা, প্রেমিক,

পরমাত্মা ও দুষ্টের দমনকারী হিসেবে পাওয়া যায় । মানব সমাজের কল্যাণে দ্রাপরের কৃষ্ণকে বর্তমানের দেবতায় রূপান্তরিত করা হয়েছে । সর্বগুণাশ্রয়ী বিপদ হরণকারী কৃষ্ণই দেবকীর অষ্টম পুত্র । অর্থাৎ কৃষ্ণকেই ইঙ্গিত করতে উপন্যাসের নামকরণ 'অষ্টম গর্ভ' । কৃষ্ণ এই উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রূপকের ছ'লে জীবনের ভালো - মন্দ, বিশ্বাস - অবিশ্বাস, সংস্কার - কুসংস্কারের মধ্য দিয়ে বর্তমানের আঙিনায় উপস্থিত হয়েছেন । এখানে কৃষ্ণ দেবতা নন, মানুষ । কৃষ্ণরূপী মানব প্রকৃতপক্ষে চরিত্র শক্তির আধার । সমগ্র উপন্যাস সে কথাই সোচ্চার ভাবে প্রকাশ করে ।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সমগ্র উপন্যাসটি তিনটি স্কন্ধে বিভক্ত । 'সংসদ বাংলা অভিধান' অনুযায়ী স্কন্ধ হল অধ্যায় বা স্বর্গ । 'স্কন্ধ' শব্দটি মূলত স্থান পেত প্রাচীন কাব্যে । শুধু পুরাতন চরিত্ররাই উপন্যাসের কাহিনিতে স্থান পায়নি, প্রতিটি অধ্যায়ের নামও পুরাণের প্রভাবে প্রভাবিত । 'অষ্টত্তর শতনাম' যেখানে সামাজিক প্রথা অনুযায়ী শিশুদের নামকরণের কথা ও তার সাথে জড়িয়ে থাকা নানা পুরাণকাহিনি স্থান পেয়েছে । অষ্টম গর্ভ বলে যাদেরকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে, দুর্গাপ্রসাদের পরিবারে তাদেরই বেড়ে ওঠার কাহিনি 'গোকুলে বাড়িছে সে' । কিংবা 'ছদ্মবেশী অসুর - অসুরিণী', বাস্তব জগতের মানুষদের বাহ্যিক আবরণের প্রভাবে মনে বাসা বাঁধা ভয় ও তা জয় করার কথা উঠে এসেছে । আদর্শ নামকরণ পাঠকের ক্ষেত্রে অনেকটাই বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করে থাকে । চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অধ্যায় নামকরণও এই উপন্যাসের কাহিনি প্রবাহের অঙ্গ । 'তৃণার্বত', 'শ্রীদাম - সুদাম - সুবল - সখা', 'নাচিকেত', 'বাসুদেব' উল্লিখিত নামগুলি উপন্যাসের ধারাকে অনুসরণ করে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এদের চরিত্র বেষ্টিত নানা কাহিনি অধ্যায়গুলির অভ্যন্তরীণ অর্থ বহন করে রয়েছে । 'নাচিকেত' অর্থাৎ উপনিষদের 'নচিকেত উপাখ্যান' অনুযায়ী বাজশ্রবা মুনি বিশ্বজিৎ যজ্ঞের দক্ষিণারূপে রাগের বশবর্তী হয়ে পুত্র নচিকেতকে যমরাজের হাতে দান করার কথা বলেন । যমলোকে গিয়ে নচিকেত নিজের জেদের বশে যমরাজকে সন্তুষ্ট করে ব্রহ্ম বিদ্যার মাধ্যমে মৃত্যুর স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন । উপন্যাসেও এই অধ্যায়ে শিশুগুলির মনে মৃত্যুকে ঘিরে নানা ধরনের বোধের জন্ম হয় ।

উপন্যাসের শুরুতেই স্বয়ং কৃষ্ণের কথোপকথন পরম শক্তির আধার সুদর্শন চক্র নিয়ে, যা দিয়ে অসুর বিনাশ করতেন পুরাণ - পুরুষ কৃষ্ণ । পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে দুষ্ট মানুষ, নেতিবাচক কূটনীতিবিদদের আনাগোনা কোনও একজন কৃষ্ণের (মানব) পক্ষে ধ্বংস করা অসম্ভব । হয়তো তাই যুগ যুগ ধরে কৃষ্ণের প্রেরণ করা সুদর্শন চক্র ফিরে না আসার বার্তা উপন্যাসের শুরুতেই পাওয়া যায় । এই চক্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে শত্রুর প্রাণনাশ না করে সে কখনো প্রত্যাবর্তন করত না । হয়তো পৃথিবীর এতশত অসুর এবং রাক্ষসের মাঝে তার ধ্বংসলীলা নিউক্লিয়ার বোমার মত খন্ডে খন্ডে বিভক্ত হয়ে গেছে । কৃষ্ণ এখানে বিরাট পুরুষ । ঋকবেদের কৃষ্ণকে বিরাট পুরুষের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল । বর্তমান সমাজের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তাই লেখিকার প্রশ্ন -

"এত দূঃশাসন কোথা হইতে আসিল? এত শকুনি!" (পৃষ্ঠা ৪, 'অষ্টম গর্ভ') ।

দৈবিক শক্তি নিয়ে বাঙালীদের বিশ্বাস চিরন্তন । এক্ষেত্রে সর্বজন প্রসিদ্ধ আদি দেবতা কৃষ্ণকে ঘিরে যুগের পর যুগ ধরে তৈরি হওয়া বিশ্বাসের প্রাচীরও যথেষ্ট মজবুত । যেকোনো ভয়াবহ সংকটের মুহূর্তে, পৃথিবীর মানব সমাজকে উদ্ধারের জন্য কৃষ্ণের আবির্ভাবের আশা প্রকৃতপক্ষে ভক্ত সমাজের দৃঢ় বিশ্বাসকেই প্রতিষ্ঠা করে । উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়

'আবির্ভাব' এ দুর্গাপ্রসাদ ও তাঁর বাবা দেশের সংকটজনক মুহূর্তে (১৯৩৯), পৃথিবীকে সর্বনাশের হাত থেকে রেহাই দিতেই যে তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র ছেলের বউ দেবহুতির গর্ভে 'তিনি'(কৃষ্ণ) আবির্ভূত হবেন সে কথাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন । দেবহুতি গর্ভাবস্থায় থাকাকালীন নিত্য ভোরে উঠে দুর্গাপ্রসাদের সাথে গীতা পাঠ করতেন । প্রসব যন্ত্রণায় দেবহুতি যখন টানা তিন দিনের বেদনাকাতর অবস্থায়, তখন বাড়ির লোকের -

"এক কানে প্রসূতির চিৎকার আর এক কানে ভাগবতের 'সত্যম পরম ধীমহি'।
বাবাও দেখছিলেন পৃথিবী আর্তনাদ করছে, সেই আর্তনাদ তাঁর কানে গেছে ।
চল্লিশ লক্ষ প্রেতের আশি লক্ষ হাত ধেয়ে যাচ্ছে তার দিকে, আসন টলছে ।
শঙ্খ - চক্র - গদা - পদ্মধারী তিনি আসছেন, নেমে আসছেন"
(পৃষ্ঠা ৮, 'অষ্টম গর্ভ') ।

গ্রন্থের পরিচয় অংশেও উল্লেখ করা হয়েছে মানব জীবনে, স্বপ্নে, আশায় - প্রত্যাশায়,

"আমাদের চেতনায় মিশে আছে কৃষ্ণকথা । তার ওপরে আছে
অবতার ভাবনা । প্রতিনিয়ত আমরা কৃষ্ণের অবতরণের
প্রত্যাশায় থাকি" (ভূমিকা, 'অষ্টম গর্ভ')

পুরাণের কৃষ্ণ দেবকীর অষ্টম গর্ভের একমাত্র সন্তান হলেও দেবহুতির অষ্টমবারের গর্ভে জন্মায় এক মেয়ে ও দুই ছেলে । মেয়েটি 'রোমশ কুৎসিত লোলচর্ম বাঁদর বাচ্চা', প্রথম ছেলে 'মায়ের মতো', 'ফর্সা টুকটুকে' এবং দ্বিতীয় ছেলেটি 'কৃষ্ণ – কানাইয়ার মত নীলবর্ণ' । অষ্টমবারের সন্তানতালিকায় একের জায়গায় তিন সন্তান আসায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে, ঠাকুরদা শিবপ্রসাদ নিজের বন্ধুস্থানীয়, ভগবত পাঠরতা কালিকামোহনের থেকে ভগবানের আগমন প্রমাণ করতে বলিয়ে নেন -

"প্রথমটি তোমার ঠিকঠাক অষ্টম গর্ভ শিবু" (পৃষ্ঠা ৯, 'অষ্টম গর্ভ') ।

প্রথম সন্তান মেয়ে তবে যে যোগমায়া ভিন্ন কেউ নয়, এ বিষয়ে ঠাকুরদার দৃঢ় বিশ্বাস । শিবপ্রসাদ ও দুর্গাপ্রসাদ পেশাগত ভাবে চিকিৎসক । বিশ্বাসের অবস্থান এখানে বুদ্ধি ও জ্ঞানের ব্যাখ্যার ঊর্ধে ।

শিবপ্রসাদের মেয়ে ও দুর্গাপ্রসাদের বাল্যবিধবা দিদি মনোরমা মিত্র মনে করতেন এবং বলতেন -

"আমরা হরিবংশ" (পৃষ্ঠা ১১, 'অষ্টম গর্ভ') ।

যদিও এ হরিবংশ পুরাণ হরির অর্থাৎ নারায়ণের বংশ নয়, এ হল বংশের আদি পুরুষ 'হরিনারায়ন' নামের -

"সুবাদে আমরা হরিবংশ" (পৃষ্ঠা ১০৫, 'অষ্টম গর্ভ') ।

বাস্তবকে বৃন্তে রেখে পাপড়ির মতো ছড়িয়ে থাকে পুরাণ, পুরাণের নামের দলিল। উপন্যাসে চরিত্রদের নাম দেব দেবীর দ্বারা প্রভাবিত। ঠাকুরদা শিবপ্রসাদ, বাবা দুর্গাপ্রসাদ, মা দেবহুতি অর্থাৎ দেবকী, স্থানীয় প্রপিতামহ হরিনারায়ন, ঠাকুরমা মাতঙ্গ মোহিনী, বন্ধু কালিকা মোহন, শিবপ্রসাদের ছেলে লক্ষীপ্রসাদ ডাক নাম ইন্দ্র/ ইন্দ্র প্রসাদ এছাড়াও অনাদিপ্রসাদ, চিন্তামনি, যাদুমনি, নীলমণি, কানু মামা সকলেই কৃষ্ণ নামের শতনামের নামান্তর। অষ্টম গর্ভের ছেলে দুটির নামকরণও পুরাণ ও পুরাণ অধ্যুষিত বিশ্বাসে তৈরি করার প্রচেষ্টা কিছুটা হাস্য-কৌতুকের ভঙ্গিতে উপন্যাসে বর্ণিত। নাম কি হতে পারে তা নিয়ে বিস্তর ভাবনার দরকার, শিশুদের বাবাও অনুভব করেনি। কারণ শিবপ্রসাদের ভগবত পাঠ করা বন্ধু -

"কালী বলে গেছে ওদের বলরাম জগন্নাথের অংশে জন্ম" (পৃষ্ঠা ২০, 'অষ্টম গর্ভ')

একসাথে 'তেমজ' হওয়ায় কৃষ্ণের বদলে 'সুভদ্রা - বলদেব - জগন্নাথ' হলেও আপত্তি ছিল না। বাপ ঠাকুরদার স্বপ্নের জগতে -

"অর্ডার কি আর সব সময় ঠিক থাকে? থাকে না।
যুগটা তো পাল্টাচ্ছে হে" (পৃষ্ঠা ৯, 'অষ্টম গর্ভ')!

দেবহুতির 'তেমজ' সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে জীবন নিয়ে টানাপোড়েন তৈরি হওয়াতে এক সন্তান বুনবুনকে দিদিমা তরুবালার কাছে পাঠানো হয়। জন্মদাত্রীর শারীরিক অবনতির কথা মাথায় রেখে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও ঘটনা কিছুটা কাকতালীয়ভাবে কৃষ্ণের জন্মের সাথে মিলে যায়। কৃষ্ণের জন্মের সময় মহামায়ার মায়াতে কারারক্ষীরা অচৈতন্য হয়ে যায়। উন্মুক্ত হয় কারাগারের দরজা। বসুদেব সদ্যজাত কৃষ্ণকে দৈববাণীর নির্দেশানুসারে রেখে আসেন গোকুলে যশোদার পাশে আর কারাগারে নিয়ে আসেন নন্দ ও যশোদার সদ্যজাত কন্যাকে। পুরাণের এই ঘটনা বহু গ্রন্থে বর্ণিত। অষ্টম গর্ভের শিশু বুনবুনকেও বাস্তবের পটভূমিতে পালিত মায়ের স্তনের উপর নির্ভর করতে হয়। বুনবুনেরও মনে হয় লেখিকার ভাষায় -

"দৈবকি নন্দন নই আর এখন যশোদা দুলাল" (পৃষ্ঠা ২৫, 'অষ্টম গর্ভ')।

তরুবালার কোলে শুয়ে দুধ খাওয়ানো মহাভারতের চিরস্মরণীয় দৃশ্যের সাথে শিল্পী - ঔপন্যাসিক সুনিপুণ হস্তে বর্ণনা করেছেন -

"অর্জুন যেন শুয়ে আছে শরশয্যায়, পিতামহ তার পিপাসা মেটাচ্ছেন।
অর্জুন আর ভূমিকা শুধু উল্টে গেছে" (পৃষ্ঠা ২৫, 'অষ্টম গর্ভ')।

কৃষ্ণের জন্মের পর, কংস দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানের জীবিতাবস্থায় কথা জানতে পেরে, নিজের প্রাণ রক্ষার তাগিদে একের পর এক রাক্ষস রাক্ষসী প্রেরণ করতে থাকেন গোকুলে। এদের মধ্যে অন্যতম হল কংস প্রেরিত পুতনা, যার উদ্দেশ্য ছিল বিষ মাখানো স্তন কৃষ্ণকে পান করিয়ে হত্যা করা। হিন্দু পুরাণ অনুসারে কৃষ্ণ পুতনার জীবনীশক্তি শোষণ করে তাকে বধ করেছিলেন। উপন্যাসে শিশুর সরল মনের নির্বাক ভঙ্গির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের বিভিন্ন গন্ধকে বিষ মাখানো স্তনের পরিবর্তে ব্যবহার করেছেন লেখিকা -

"ধোঁয়া – পুতনার কাছ থেকে পালাচ্ছি । . . . . .
আঁশ – পুতনার হাত থেকে পালাচ্ছি ।. . . . .
তেল – পুতনার কাছ থেকে পালাচ্ছি" (পৃষ্ঠা ৩৪, 'অষ্টম গর্ভ') ।

এখানে পুতনা শিশুর অপছন্দের বিষয় হয়ে উঠেছে । অন্যদিকে আবার মায়ের গায়ের গন্ধ সকল শিশুর কাছে অত্যন্ত প্রিয় । সেই গন্ধ পেয়ে ক্রন্দনরতা শিশুও নিজেকে বোঝায়

"মুখের পানের গন্ধ, বুকে দুধের গন্ধ, গালে গাল বুকে বুক
যশোমতির স্নেহের গন্ধ গলে গলে পড়ছে । আস্তে আস্তে
শান্ত হই। " (পৃষ্ঠা ৩৮, 'অষ্টম গর্ভ') ।

কখনো রূপের দাঁড়িপাল্লায়, কখনো বুদ্ধির পরিমাপের ভিত্তিতে, আবার কখনো আচরণগত দিক থেকে বাঙালির ঘরে সন্তানদের বিভিন্ন দেবদেবীর নামের সঙ্গে তুলনা করা হয় । সাহিত্য মানব জীবনের কথা, ঘরের কথা, সমাজের কথা । বাল্যবিধবা পিসীমার 'বেঁটেত্ব', 'তুলো ভরা ছোট ছোট বালিশের মত', পা 'মাটির প্রতিমার আঙুল'নিয়ে বাঙালির লৌকিক দেবীতে পরিণত হয়েছেন । শিশুদের চোখে তাই,

"পিসিমা একটি মিনিয়েচার লক্ষী" (পৃষ্ঠা ৪৭, 'অষ্টম গর্ভ') ।

প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মী চঞ্চলা । অথচ বাঙালির ঘরের মেয়েদের লক্ষী হয়ে থাকার অর্থ হচ্ছে শান্ত প্রকৃতির কন্যা সন্তান । অন্যদিকে গ্রাম অঞ্চলে লক্ষীর প্রচলিত ছড়া অনুযায়ী -

"আমি আঁকি পিটুলির বালা
আমার হোক সোনার বালা"

অর্থাৎ ধনসম্পত্তির কামনা । সম্পত্তির অধিকার ব্যক্তিকে 'লক্ষ্মীহীন' আর 'লক্ষীছাড়া' হলো যার চরিত্রের ঠিক নেই । লক্ষী সংসারে নানা বিষয়ে অর্থবহ । উপন্যাসে ছোটখাটো ফর্সা, সুন্দরী, তুলোর মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছাড়াও পিসিমা - লক্ষ্মীর মুখরোচক খাবার বানানোর লক্ষ্মীমন্ত হাত ছিল । যা পরে তিন শিশুর একজন রপ্ত করে ।

সংসারে গর্ভাবস্থায় এমনকি সন্তান জন্মানোর পর, স্কুলে যাওয়ার সময় না হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন পুরাণের লোক প্রচলিত কাহিনি গল্পের ছলে শিশুদের শোনানো হয় । ছোট ছোট চোখে তারা নিজেদের কল্পনার জগতে সেইসব দেবদেবী ও অসুর রাক্ষসদের জীবনদান করে থাকে । যেমন পমপমদিদি বা ঋদ্ধির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আচরণ বিভিন্ন পুরাণের চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে -

"পমপমদিদির চুলে কালি, চোখে দুর্গা, ঠোঁটে নিবেদিতা,
অঙ্গে মা শ্রী শ্রী সারদাময়ী । ...আমি জানি পমপমদিদি
শাপগ্রস্তদেবী, হয়তো সরস্বতী কিংবা দুর্গা । পৃথিবীর
অসুরদের খুব খারাপ সময় আসছে" (পৃষ্ঠা ৬৪, 'অষ্টম গর্ভ') ।

রামায়ণের সন্ন্যাসীর বেশে কর্ব্বুররাজ রাবণ দেবী সীতার কাছে ভিক্ষা চাইতে আসেন নিজের বোনের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনা নিয়ে । বিধবা শূর্পণখাও প্রেম ভিক্ষা করেন প্রথমে পুরুষোত্তম রাম ও রাম দ্বারা প্রত্যাখ্যানের পর লক্ষণ এর কাছে । যে সময়ের জীবনকথা ও জীবন অভিজ্ঞতা 'অষ্টম গর্ভ' - এর উপজীব্য বিষয়, সে সময়ে উত্তর কলকাতার অলিতে-গলিতে ভিক্ষুকের চলাচল অল্পের থেকে কিছু বেশিই ছিল । 'তেমজ'দের এই অভিজ্ঞতা আর রামায়ণের ভিক্ষা গ্রাহকদের কাল্পনিক বেশভূষার মধ্যে তেমন পার্থক্য ছিল না । ছোটদের ছেলেধরার ভয় দেখানোর ব্যাপারটার মধ্যে দুটি সুবিধাও ছিল । প্রথমত বাচ্চারা যত্রতত্র একা যেতে ভয় পেত, দ্বিতীয়ত কল্পনার ঝুলি প্রসারিত হত । পথে-ঘাটে ঝুলি কাঁধে কোন অপরিচিত মানুষকে দেখলে শিশুদের মনে 'ছেলেধরা' শব্দটি অচিরেই উঁকি দিত । ঝোলার মহিমা সময়ের সাথে সাথে ছেলেধরার প্রতীকে পরিণত হয় । এর মধ্যে এক ভিখারিনী ছিল যে 'শ্মশানের মত চুপচাপ' পাড়াতে ঢুকে নিজের বাজখাই গলায় ভিক্ষা চাওয়ার অপরাধে ঠাকুমা'র কাছে 'তারকা রাক্ষসী' নাম উপহার পেয়েছিল । রামায়ণের এই রাক্ষুসী নিজের মনোবাঞ্ছা পূরণ না হওয়ায় অগস্ত মুনির আশ্রম ধ্বংস করে, তার শিষ্যদের গিলে খেয়েছিল । এরকম রাক্ষস রাক্ষসী আসলে সাময়িক শান্তির পথে বাধা দিলেই মানবসমাজের কল্পনার জোরে জীবন্ত রূপ লাভ করে - অন্য কোন দেহে, অন্য কোন রূপে, অন্যভাবে ।

তবুও -

> "এরাই আমাদের ধেনুকাসুর, শকটাসর, অঘাসুর, বকাসুর. . .কোন ও না কোনওভাবে হয় ছদ্মবেশ ভেদ করে, নয় মজা পেয়ে, নয় রোমাঞ্চিত হয়ে অর্থাৎ ভয় না পেয়ে আমরা এদের জয় করছিলুম" (পৃষ্ঠা ৯৪, 'অষ্টম গর্ভ') ।

এদের জ্য করা আসলে সত্য উদঘাটন করা, বাস্তব জগতে মায়াশক্তি নেই, আছে মনের জোর, আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা, সত্যান্বেষী হয়ে ওঠার প্রেরণা । অন্য এক ভিখারিনী হীরামতিকে কালো শাড়ির সাথে বাউটি মাগড়ী পড়ে, শীতের সন্ধ্যায় ভয়ঙ্কর রূপে অবতরণ হতে দেখা যেত । হীরামতি যে প্রকৃতপক্ষে দুলালী তা জানতে পারতেই -

> "ব্যাস, শেষ রাক্ষসীটি বধ হয়ে গেল" (পৃষ্ঠা ৯৪, 'অষ্টম গর্ভ') ।

তিনটি স্কন্ধে বিভক্ত উপন্যাসটিতে মেটাফোর কৃষ্ণ পুরাণ চরিত্র হলেও বাস্তব কাহিনি দাঁড়িয়ে আছে ভূমিকম্প, দাঙ্গা এবং স্বাধীনতার ও দেশের জন্য আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে বড় হয়ে ওঠা তিনটি খুদে শিশুকে ঘিরে, তাদের মনের পরিবর্তনকে আশ্রয় করে । দেশের প্রতি ভালোবাসা তৈরি হওয়ার আগে গয়নার প্রতি আগ্রহ থেকে বুনবুনের সরল চেতনায় বিরূপ প্রতিফলন ঘটে । মায়ের গয়না সব ভাই-বোনরা মিলে পড়বে সে আশা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় বুনবুনের । যখন সে জানতে পারে -

> "দেশের কাজে দেবু সব দিয়ে দিয়েছেন । তোদের বাবা তো দেশের কাজ করতো কিনা" (পৃষ্ঠা ৭৫, 'অষ্টম গর্ভ')!

দিদির মুখে মায়ের গয়না সম্পর্কে এই কথা শুনে, বুনবুনের রাগ ঝরে পড়ে দেশের উপর –

"দেশ বাজে, দেশ বিচ্ছিরি, দেশ চোর" (পৃষ্ঠা ৭৫, 'অষ্টম গর্ভ') ।

দেশের অবস্থা ছুঁয়ে, উপন্যাসের দ্বিতীয় স্কন্ধে প্রবেশ করেন ঔপন্যাসিক । ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দাঙ্গা ও তার প্রভাবে শিশুমনের উত্তেজনার আবহ তৈরি হয় । বুনবুন ও পুনপুনের কানে আসে 'দুটি স্কুল মুসলমানদের হাতে', মসজিদে দশ হাজার মুসলিম গুন্ডা জমায়েত আর এসব থেকেই ওদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয় । মাকে ঘিরে রাতে শোয়ার অভ্যাস তৈরি হয় । কিছু না জেনে শুধুমাত্র ভয় থেকেই তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হয় মুসলমানরা -

"রাক্ষস ধরনের কিছু হবে" (পৃষ্ঠা ১৪২, 'অষ্টম গর্ভ') ।

হীরামতি রাক্ষসীর মত মুসলমান রাক্ষসদেরকেও বধ করেছিল তিন শিশু - বাবা ও দাদার কথা শুনে, নবধারণা লাভের মধ্য দিয়ে -

"এক মায়ের পেটের সন্তান ছিলুম আমরা এই কপুরুষ আগেই । পান্ডবও তো আসলে কৌরবই । কে আল্লাহ, কে ব্রহ্ম কেউই জানেনা । . . . . আমাদের মনগড়া নামে তিনি ধরবেন কেন বাবা? মাত্র সেইটুকু নামের আর আচারের বিভেদের ছুতো ধরে যদি কতগুলো সুযোগসন্ধানী ক্ষমতালোভী আমাদের যখন তখন খেপিয়ে দিতে পারে, আমরা এমনি করে একে অপরকে খুন করবো" (পৃষ্ঠা ১৪৫, 'অষ্টম গর্ভ')!

উপরিউক্ত উক্তি শুধু রাক্ষস বধ করার কথা বলেনা, দেশের অবস্থা বোঝার প্রথম শিক্ষাটাও দিয়েছে শিশুমনগুলোকে । মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, গান্ধিজী, নেতাজী সকলের কাজের সাথে পরিচয় ঘটে নিষ্পাপ মনগুলির । কথায় আছে "মহত্বাদ ভারতবত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে" অর্থাৎ 'যা নেই ভারতে তা নেই মহাভারতে'। বুনবুনরা চেয়েছিল 'আজব এক ইচ্ছাপূরণের' দেশ যেখানে সব থাকবে সবাই থাকবে । কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর -

"ওর নায়ক ধৃতরাষ্ট্র - গান্ধারী - কুন্তি - বিদুর এদের সঙ্গ এবং যা চাইছিলেন সেই রাজত্ব, অতুল ঐশ্বর্য ভাইয়েদের আনুগত্য, সহযোগিতা প্রজাদের সন্তোষ একসঙ্গে পাননি" (পৃষ্ঠা ১৬২, 'অষ্টম গর্ভ') ।

কিন্তু এর পরও আপনজনের সান্নিধ্য নিবিড় বন্ধন ফিরে আসেনি এই বীরদের জীবনে । বাস্তব পুরাণের মেলবন্ধন ক্রমশ জীবন তত্ত্বের আনয়ন ঘটিয়েছে -

"আমরা অনেকেই একটা জঙ্গলাকীর্ণ, রুক্ষ - অনুর্বর খান্ডবপ্রস্থ পাই, তাকে ইন্দ্রপ্রস্থে পরিণত করবার পরই রাজসূয় যজ্ঞে আমাদের পেয়ে বসে, আর তত্ত্ব দেখবার জন্য আমরা দূর্যোধনদের খুঁজে খুঁজে বার করি" (পৃষ্ঠা ১৬২, 'অষ্টম গর্ভ') ।

এরপরই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে হারিয়ে যায় বাড়ির চাকরের হাত থেকে দুর্গাপ্রসাদের ছেলে পাবন অর্থাৎ পুনপুন, আবার ফিরেও আসে একদল স্বেচ্ছাসেবী ছেলেদের হাত ধরে । দূর্গাপ্রসাদ ডাক্তার, বিজ্ঞানের ছাত্র কিন্তু ধর্মপ্রাণ পুরুষ ।

দূর্গাপ্রসাদ ছেলে হারানোর ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে মহাভারতের কৃষ্ণ আবির্ভাবকে সামনে রেখে -

> "কংস সেবার পাঠায় তৃণাবর্তসুরকে। ক্রীড়ারত যশোদা দুলালকে সে বাতাসের ঘূর্ণির রূপ ধরে উড়িয়ে নিয়ে যায়। সারা ব্রজ যখন শিশুর জন্য হায় হায় করছে এক বিকট অসুরের মৃতদেহের বুকের ওপর শিশুটি তার গলা জড়িয়ে হাসছে" (পৃষ্ঠা ১৭৭, 'অষ্টম গর্ভ')।

হতাশার মাঝে নতুন স্বপ্ন দেখে প্রশ্ন করে -

> "তবে কি এখনো আশা আছে? এই ছেঁড়া খোঁড়া হতশ্রী দেশ, চতুর্দিকে অমঙ্গলের চিহ্ন! সুভাষ মৃত বলে ঘোষিত! তবু কি সব শেষ হয়ে যায়নি? আছে? আশা?" (পৃষ্ঠা ১৭৭, 'অষ্টম গর্ভ')।

সুভাষচন্দ্র বসুর দেখা এক দেশ এক ভারতের স্বপ্নকে ফিরে পেতে চেয়েছিল দুর্গাপ্রসাদ। খন্ডিত দেশ তার কাছে হয়ে গেছে - 'হতভাগ্য'। ঘর ছাড়া, দুর্ভিক্ষ পীড়িত, দরিদ্র, ভাগ্যের হাতে কুপোকাত মানুষগুলির স্বল্প পরিমাণ খাদ্যের চাহিদার নিয়ে গড়ে ওঠা এমন হতশ্রী দেশ চাইনি শিবপ্রসাদের ছেলে দুগগি। তবুও আগামীর স্বপ্ন চোখে নিয়ে আশায় বুক বেঁধে ভালো কিছু পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে মানুষগুলি। যে বুনবুন একসময় দেশকে খারাপ বলে নিজের ক্রোধকে প্রকাশ করেছিল, তারই কাছে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা, গৃহহীন অসহায় অত্যাচারিত মানুষগুলির কষ্ট, শিয়ালদা স্টেশনে এদের যন্ত্রণার ছবি সহ্যাতীত হয়ে যায়। মিনু ও মিনুর মায়ের চিন্তা তাকে ব্যথিত করে। উদ্বাস্তুরা কলকাতায় এসে যে যেখানে জায়গা পেয়েছে বা জোর করে জায়গা করে নিতে পেরেছে সেখানেই নতুন বাসা করে নিয়েছে। এসময় পাকুরমার বাড়িতে এমন অনেক উদ্বাস্তুরই ঠাঁই হয়।

মহাভারতের প্রতিটি চরিত্র মনের বিশেষ কোন গুণের কথা বলে। মানুষের অভিমানের প্রতীক কর্ণ, নিষ্ঠা ও শ্রমের প্রতীক অর্জুন। ঠাকুরদা নিজেও -

> "দুঁদে পুলিশ অফিসার কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিপ্লবী" (পৃষ্ঠা ২৩৭, 'অষ্টম গর্ভ')।

তাঁর একই সাথে কৃষ্ণ ও কর্ণ সাজার কথা। গুপ্ত বিপ্লবী যে সেসময় দেশপ্রেমিকদের অভিমান, কঠোর শ্রমের ফলে স্বাধীনতা লাভের পথ তা চরিত্রগুলির গুঢ়ার্থ বিশ্লেষণ করলেই আয়ত্ত করা সম্ভব। ঔপন্যাসিক জীবনের পথে উত্তরণের দিশা দেখিয়েছেন সারোদাবাবুর কথায় -

> "আমাগো প্রয়োজন এখন একটি কৃষ্ণ অবতারের" (পৃষ্ঠা ৩১৩, 'অষ্টম গর্ভ')।

কিন্তু

> "কলি কালে অবতার পুরুষেরও মিরাকুলাস পাওয়ার থাকে না" (পৃষ্ঠা ৩১৩, 'অষ্টম গর্ভ')।

বুবু আটা মাখতে পারে, মাছ বাছতে পারে কিন্তু এসব পুনপুন পারে না। পুনপুন বুঝিয়ে দেয় বুবুকে যে কেউ সব পারে না। তিনটি শিশুর কথাবার্তার মধ্য দিয়ে একে অপরের ক্ষমতার পরিমাপ করতে গিয়ে বুনবুন বলে ওঠে -

"সবাই মিলে সব পারবো" (পৃষ্ঠা ৩১৬, 'অষ্টম গর্ভ') ।

অর্থাৎ কেউ একা সম্পূর্ণ নয়। কবি কামিনী রায়ও একই মনের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর রচিত 'সুখ' কবিতায় -

"সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"

দীর্ঘ কাহিনি নিতান্ত কথকের জীবনের কথা তা বললে যে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলা হবে সেটা সত্য। শিশুরা কাহিনির প্রাণ। তাদের মানসিক সরলতা থেকে বাস্তব বোধের শিখন, দেশ ও মানুষকে বোঝার পথ উন্মুক্ত করেছে। ভারতের মহাভারত, রামায়ণ, হিন্দুদের বিভিন্ন পুরাণের গল্প, চরিত্র ও বাস্তব জগতের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের সুনিপুণ বুনন রয়েছে। শিশু নয় তবুও শিশুর মতো আচরণ করা মানুষগুলি নিজেদের জীবনের সার অনুসন্ধান না করে কোনও এক চমৎকার ঘটার অপেক্ষায় দিন গোনে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ, কৃষ্ণের শতনাম - এর ব্যবহার জীবন্ত চরিত্রগুলিকে অলোকিত করে তোলে। আবার সেই আলোর মধ্য দিয়ে জীবনের রসতত্ত্ব অনুসন্ধান করতে শেখায়। চিরন্তন সত্যকে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে এই মানুষরাই দেব - দেবী, অসুর, রাক্ষসে পরিণত হয়েছে। জীবনে চলার পথের এই চিরন্তন সত্য মহাভারতেও নিহিত ছিল - নিরন্তন সংঘর্ষ চালিয়ে যেতে হবে, সাফল্যই হবে লক্ষ্য, নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে জানা ও ভরসা করা; ভয়কে জয় করা মানুষের ধর্ম। ধর্ম যা ধারণ করতে শেখায়। আশ্চর্যজনকভাবে এই তিনটি শিশু মহাভারতের এই উপদেশগুলিকে উপন্যাসের শেষে সকলের থেকে বেশি গভীরভাবে বুঝতে শেখে -

"তিন জোড়া অপটু হাত বুঝি এই পৃথিবী এই সভ্যতার উপকরণগুলোর
বিন্যাস অদলবদল করে দিয়েই গড়ে ফেলতে চাইছে এক চতুর্থ পৃথিবী"
(পৃষ্ঠা ৩১৮, 'অষ্টম গর্ভ') ।

অষ্টম গর্ভের অপেক্ষায় মানবজগৎ মনকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে পারে। কোন অষ্টম গর্ভই বিনা চেষ্টায় সংকট মুক্তির পথ বাতলে দিতে পারে না। পরিশ্রম, একাগ্রতা, মানসিক দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণ নতুন পৃথিবী গড়তে সহায়ক হয়ে ওঠে। তাই যারা অন্ধকার ছাদে যাওয়ার জন্য ভীতুর মত অন্যের সাহায্য খুঁজতো, তারাই কাউকে না বলে উন্মুক্ত ছাদে একে অপরের সহযোগিতায় শান্তির ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। এ যেন চরিত্র শক্তিকে খুঁজে পাওয়ার স্বাধীনতা। শিশুদের প্রিয় পূর্ববঙ্গ থেকে আসা পাকুমার পরশমণির খোঁজ পায় বুনবুন তার মনের গভীর সমুদ্রে, অনুভবের ঢেউয়ের মাঝে যেখানে -

"সম্মিলিতভাবে তারা নিজেরাই তো সেই অবতার পুরুষ যার জন্য
সারদাবাবুদের, দুর্গাপ্রসাদের আরো কত কোটি কোটি মানুষ,
দুর্গত মানুষ, অন্যায় অবিচারে ক্ষতবিক্ষত মানুষের প্রার্থনা ।"
(পৃষ্ঠা ৩১৬, 'অষ্টম গর্ভ') ।

ধর্ম বা বর্ণ কোনো মানুষের স্বাধীনতার ইচ্ছা বা অধিকারকে দমন করতে পারে না। কৃষ্ণ একটা চরিত্রশক্তি যা সব মানুষের অন্তরে ঘুমিয়ে থাকে। মানুষ নিজেকে বুঝতে শিখলেই মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা কৃষ্ণকে খুজে পেতে পারে, যেভাবে উপন্যাসে ছোট্ট তিনটি শিশু পেয়েছিল। অলৌকিকের অপেক্ষায় দিন গোনার বদলে নিজেদের মনের শক্তি ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় এগিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই কৃষ্ণ লাভ হয়। সমাজকে সুগঠিত করার পথের প্রথম পদক্ষেপ নিজেকে সংবদ্ধ করে তোলা।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ :

১. বসু বাণী, 'অষ্টম গর্ভ', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৯, প্রথম সংস্করণ - ২০০০.

সহায়ক গ্রন্থ :

১. সেনগুপ্ত চন্দ্রমল্লী, 'মিথ - পুরাণের ভাঙাগড়া', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ২০০১.

২. চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, 'কৃষ্ণ চরিত্র', 'বিবিধ প্রবন্ধ', বঙ্গদর্শন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ১৮৮৭.

৩. দাশ সম্পদ, 'বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ', অর্ঘ্য প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ - ২০১৮.

৪. লাহিড়ী শিব প্রসন্ন, 'মহামানব শ্রীকৃষ্ণ', নিউ এজ পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ - ২০০৩.